আমার দেশের রূপকথা

যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে সম্পাদনা করেছেন :

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কিশোর ভারতী

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬

মলাটের ছবি এঁকেছেন :
শ্রীহরেন চক্রবর্তী

ভিতরের ছবি এঁকেছেন :
শ্রীঅরুণ গুপ্ত

ছেপেছেন :
শ্রীফণিহার চট্টোপাধ্যায় :
মুদ্রণালয়
২৮।৩, ঝামাপুকুর লেন

মলাটের ছবি ছেপেছেন :
মোহন প্রেস
২, করিস চার্চ লেন

প্রকাশ করেছেন :
গীতা ও অশোক
৯, ফকির চাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট

প্রাপ্তিস্থান :
মেসার্স এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ,
১৪, বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মূল্য : এক টাকা

—আমার কথা—

ছোটরা রূপকথা ভালবাসে। সেইজন্য সর্বদেশেই ছোটদের জন্য অসংখ্য রূপকথার প্রচলন আছে। বাংলা দেশেও রূপকথা আছে বহু। বইও আছে অনেক। কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলিতে ছোটদের রূপকথাকে যেমনভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর করে ছোটদের মনের মত করে তোলা হয়, আমাদের দেশে তেমনটি বড়-একটা দেখা যায় না। সেই অভাবের দিকে দৃষ্টি রেখেই বাংলার অতি-পুরাণো ও অতি-প্রচলিত চারিটি রূপকথা বেছে নিয়ে, যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে এই গ্রন্থখানি সংকলন করেছি, যতদূর সম্ভব সচিত্র করারও চেষ্টা করেছি। আমার এই প্রচেষ্টা ছোটদের মুখে যদি হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। ইতি—

সম্পাদক—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সূচী ঃ

পৌষালী

পৌষলী

পৌষের দিনে দুপুর বেলা
দাওয়ার 'পরে ছেলের মেলা,
ঠাক্‌মা বুড়ী ভাল বেসে
গল্‌প বলেন হেসে হেসে—
নাত্‌নী-নাতি ভুললো খেলা,
কথা-কথায় ফুরায় বেলা,
একটু 'খন থামলে পরে
ছেলেরা বলে—তারপরে ?
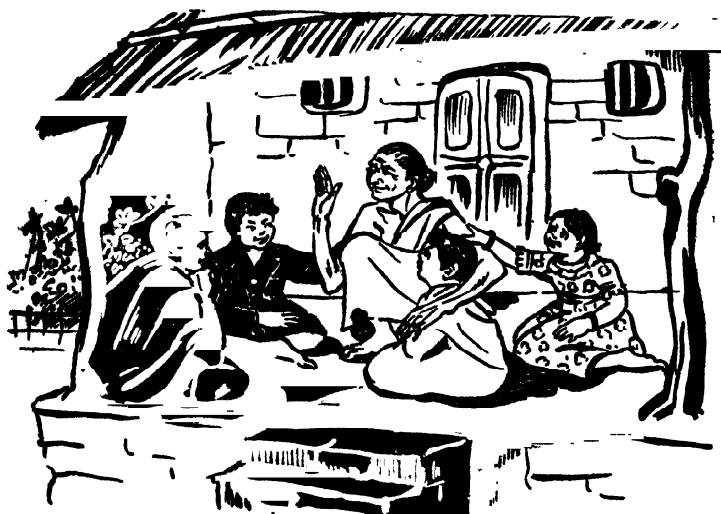
এক গাঁয়ে এক ছিল রাখাল। পৌষ মাসে এক দিন সে বললে—মা, পৌষ মাসে সবাই পিঠে খায়। আজ আমি পিঠে খাব!

মা এক থালা পিঠে গড়ে দিলেন ছেলেকে। রাখাল পিঠে খায় আর গরু চরায়, রোদ পোহায় আর পিঠে খায়।

দুপুরের রবি আকাশের গায় ঢলে পড়লো, রোদ ফুরালো, আঁধার ঘনিয়ে এল। তখনও রাখালের একখানি পিঠে খেতে বাকী। রাখাল

পিঠেখানি মাটিতে পুঁতে দিয়ে বললে—কাল পিঠে গাছ গজাবে, আমি পিঠে পাড়বো আর খাব!

পরদিন সকাল বেলা গরু চরাতে এসে রাখাল দেখে তার কথা ফলে গেছে, মাঠের মাঝে বিরাট এক পিঠে গাছ গজিয়েছে। পিঠে গাছে এক গাছ পিঠে, ডালে ডালে পিঠে, রকমারি পিঠে—পুলি পিঠে, ভাজা পিঠে, রসের পিঠে,—শুধু পিঠে আর পিঠে, কত খাবে খাও।

রাখালের মন তো খুসিতে নেচে উঠলো, তখনই গাছে উঠে এক ডালে বসলো আর এক ডালে পা রাখলো, একটি একটি করে পিঠে খায় আর গান গায়—

পুলি পিঠে সাদাসিদে,
ভাজা পিঠে ভালো,
রসের পিঠে ভারী মিঠে
বেজায় রসালো।

এমন সময় কোথা থেকে এক বুড়ী এসে বললে—গাছে উঠে কি খাস্, বাবা ?

রাখাল বললে—পিঠে,—পুলি পিঠে, ভাজা পিঠে, রসের পিঠে।

বুড়ী বললে—বাবা, আমায় একটা দে না।

রাখাল বললে—হাত পাত্।

বুড়ী বললে—হাতে রস লাগবে।

রাখাল বললে—আঁচল পাত্।

বুড়ী বললে—আঁচলে রস লাগবে।

রাখাল বললে—তবে মাটিতে দিই।

বুড়ী বললে—পিঁপড়েয় খাবে।

রাখাল বললে—তবে কোথায় দোব ?

বুড়ী বললে—আমার ঝুলির ভিতর দে।
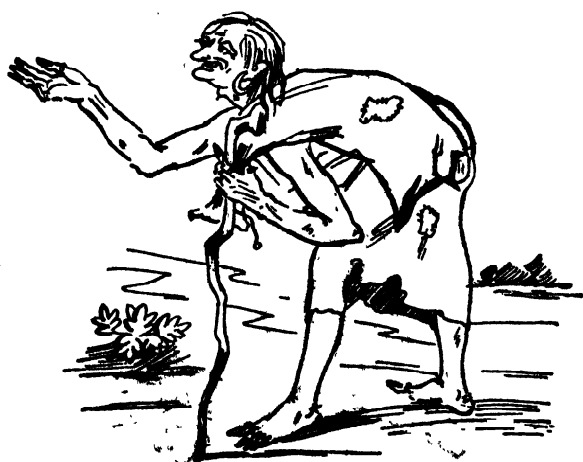
রাখাল গাছে থেকে নেমে যেই ঝুলির ভিতর পিঠে দিতে গেছে, অমনি বুড়ী খপ্ করে তাকে ধরে ঝুলির ভিতর পুরে ফেললো।

তারপর ঝুলি কাঁধে ফেলে বুড়ী চললো মাঠ ভেঙে।

কত পথ, কত মাঠ বুড়ী পার হলো। যেতে যেতে বুড়ীর খুব পিপাসা লাগলো। মাঠের মাঝে এক পুকুর-পাড়ে ঝুলি রেখে সে গেল জল খেতে। রাখাল তখনই ঝুলির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো। পাছে বুড়ী তখনই টের পায়, তাই ঝুলির ভিতর সে ভরে দিল যত ইট-পাটকেল, আর একটি নারিকেলের মালার ভিতর এক মালা জল।

বুড়ী জল খেয়ে এসে ঝুলি কাঁধে ফেলে আবার চললো মাঠ ভেঙে। ঝুলি নড়ে আর নারিকেলের মালার জল চল্‌কে পড়ে। বুড়ী ভাবে ছেলেটা কাঁদছে, চোখের জলে ঝুলি ভিজছে। বুড়ী হাসে আর বলে—

কেঁদে কেঁদে সারা হলি'
ভিজে গেল কাঁধের থলি।
তোকে রেঁধে খাব ঝোল,
মিছে কেন করিস্ গোল।

বুড়ী বাড়ী এসে পোঁছাল, হাঁক দিল—ও বউ দেখ, কেমন একটা কচি ছেলে ধরে এনেছি।

বুড়ীর বউ ছুটে এসে ঝুলি খুললো, দেখে ঝুলির ভিতর যত ইট আর পাটকেল, বললো—ছেলে কোথায়?

বুড়ী তো অবাক। বললে—তাই তো, পুকুরে জল খেতে গেছি আর ছোঁড়া পালিয়েছে। ভারী চালাক ছেলে তো। রোস্, আবার এখনই গিয়ে ধরে আনছি।

ঝুলি কাঁধে নিয়ে রাগে ঠক্ ঠক্ করতে করতে বুড়ী তখনই আবার বেরিয়ে পড়লো।

এদিকে রাখাল ফিরে এসে তখন আবার পিঠে গাছে উঠে এক ডালে বসে, আর এক ডালে পা দিয়ে মনের স্থখে মজা করে পিঠে খায় আর গান গায়—

পুলি পিঠে সাদাসিদে,
ভাজা পিঠে ভালো,
রসের পিঠে ভারী মিঠে
বেজায় রসালো।

বুড়ী গাছতলায় গিয়ে বললো—ও বাবা, গাছে বসে কি খাস্ ?

রাখাল বললে—পিঠে খাই, তোর কি ?

বুড়ী বললে—আমায় একটা পিঠে দে না।

রাখাল বললে—দূর দূর ! তুই আমায় এখনি ধরে নিয়ে গিয়েছিলি না ! ফের এসেছিস্ কি মেরে তোর হাড় গুঁড়িয়ে দোব।

বুড়ী ভাল মানুষ সেজে বললে—আমি আবার কখন তোকে ধরে নিয়ে গেলাম বাবা ?

রাখাল বললে—এই তো, একটু আগে।

বুড়ী বললে—না বাবা, সে আমি না, সে আর কেউ। দে বাবা, আমায় একখানা পিঠে দে, অনেক দিন পিঠে খাইনি।

রাখাল বললে—তবে হাত পাত্।

বুড়ী বললে—না বাবা, হাতে রস লাগবে।

রাখাল বললে—তবে আঁচল পাত্?

বুড়ী বললে—না বাবা, আঁচলে রস লাগবে।

রাখাল বললে—তবে মাটিতে দিই।

বুড়ী বললে—না বাবা পিঁপড়েয় খাবে।

রাখাল বললে—তবে কোথায় দোব?

বুড়ী বললে—আমার ঝুলির ভিতর দে।

রাখাল বললে—হ্যাঁ, আমি গাছ থেকে নামি আর তুই আমাকে ধরে নিয়ে যা।

বুড়ী বললে—না বাবা, তোকে আমি ধরবো কেন? গরীব মানুষ, শুধু একখানা পিঠে খাব।

রাখাল গাছ থেকে নেমে এলো। বুড়ীর ঝুলির ভিতর যেই সে পিঠে দিতে গেছে অমনি খপ্ করে বুড়ী তাকে ধরে ঝুলির ভিতর ভরে ফেললো। বললো—

বাপ ধন, পালাও এবার,
দেখি কত চালাকি তোমার।
পুকুর পাড়ে আর যাব না,
এবার আর জল খাব না।

তারপর ঝুলি কাঁধে ফেলে বুড়ী চললো সেই মাঠ ভেঙে—কত পথ, কত মাঠ !

এবার আর বুড়ী থামলো না কোথাও। বরাবর একেবারে বাড়ী পোঁছে হাঁক দিলে—ও বউ, দেখ্ আবার ঠিক ধরে এনেছি।

বউ তো তখনই ছুটে এল, ঝুলি খুলে দেখলো, দেখে ভারী খুসি হলো।

বুড়ী বললো—ঢেঁকিতে পেড়ে কেটে কুটে ভাল করে রাঁধ, ঝোল রাঁধ, ঝাল রাঁধ, আমি কুটুম-বাটুমদের সব খেতে বলে আসি। এমন কচি মাংস তারা অনেক দিন খায়নি।

বুড়ী চলে গেল কুটুম-বাটুমদের বলতে। এদিকে বউ ঢেঁকি পেড়ে বসলো রাখাল ছেলেকে কুটতে।

রাখাল ছেলেকে সে ধরে আনলো ঢেঁকির পাশে, রাখাল তো ঢেঁকি দেখে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে। যত হাসে তার দুধের মত দাঁত ততো ঝক্‌মক্ করে। সেই ঝক্‌ঝকে দাঁত দেখে ডাইনী- বউ বললে—বাঃ, বেশ

দুধের মত ঝক্‌ঝকে দাঁত তো, হাসলে তোকে বেশ মানায় তো, কি করে অমন ঝক্‌ঝকে দাঁত হয় বল্‌ত ?

রাখাল হেসে বললে—তোমারও অমনি দাঁত হবে।

বউ বললে—কি করে হবে বল্‌ না ?

রাখাল বললে—যা বলি তাই কর।

বউ বললে—কি বল্‌ ?

রাখাল বললে—তবে তুমি ঢেঁকিতে শোও। আমি ঢেঁকিতে তোমার দাঁতগুলো ঠিক করে দিই।

বউ ঢেঁকিতে শুয়ে পড়লো। রাখাল ছেলে তখনই তাকে ঢেঁকিতে কুটে ফেললো।

তারপর কেটে-কুটে তাকে রেঁধে রাখলো —ঝাল ঝোল।

তারপর ডাইনী-বউয়ের কাপড় পরে, বউয়ের গয়না গায়ে দিয়ে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে, ঘরের কোণে বউ সেজে বসে রইলো।

এদিকে বুড়ী তো কুটুম-বাটুমদের ডেকে আনলো। রাখালের মুখে তখন এক মুখ ঘোমটা, মুখ দেখা যায় না।

বুড়ী বললে—কি বউ, রাঁধা হয়েছে ?

রাখাল বললে—হয়েছে, ঝাল রেঁধেছি, ঝোল রেঁধেছি।

বুড়ী বললে—তাহলে এবার ঠাঁই করে খেতে দে, আমরা খেতে বসি।

রাখাল ঠাঁই করলো এক মুখ ঘোমটা দিয়ে, কুটুম-বাটুম সবাইকে বসিয়ে পরিবেশন করে খাওয়ালো।

বুড়ী বললে—বউ, এবার তুই খা।

রাখাল বললে- -আগে পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি।

রাখাল ছেলে পুকুরে গেল। পুকুর তো নয় খুব বড় এক দীঘি। সাঁতরে রাখাল ওপারে গিয়ে উঠলো। তারপর গায়ের গয়না-গুলো খুলে পোঁটলা বাঁধলো, বেঁধে পুকুর-পাড় থেকে হাঁক দিলে—ও বুড়ী! ও ডাইনী বুড়ী! বলি, ও রাক্কুসে বুড়ী!

ডাক শুনে ডাইনী বুড়ী ছুটে এলো দীঘির ধারে। রাখাল তখন ওপার থেকে কলা দেখিয়ে বললে—

ডাইনী বুড়ী পিঠে খাবি, আমার সাথে চল্।
তোর বউকে রেঁধে এলুম, কেমন মজা বল্।

বুড়ী তো হাউ চাউ করে উঠলো, বললো —ধর্ ধর্ ! মার্ মার্ !

রাখাল বললে—এবার আমার মাঠে যাবি
কেমন মজা টের পাবি।

গয়নার পোঁটলা নিয়ে রাখাল দৌড় দিল।

বুড়ী এপারে হায় হায় করতে লাগলো।

ফিরে এসে রাখাল আবার গাছে উঠে বসলো। এক ডালে বসলো, এক ডালে পা রাখলো, পিঠে খায় আর গান গায়—

পুলি পিঠে সাদাসিদে,
ভাজা পিঠে ভালো,
রসের পিঠে ভারী মিঠে
বেজায় রসালো।

সাত ভাই চম্পা

সাত ভাই চম্পা

এক ছিল রাজা।

রাজার দুই রাণী—বড় রাণী আর ছোট রাণী। বড় রাণীর অহংকার ছিল খুব, রাজার বড় রাণী সে, কারও সংগে ভাল করে কথা কয় না, দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না, সদাই রম্ রম্ ঝম্ ঝম্ করছে।

ছোট রাণী মানুষটি ছিল খুব ভাল, মুখে হাসি তার লেগেই আছে, কখনও কাউকে

একটা চড়া কথা সে বলতো না। তাই বড় রাণীর চেয়ে ছোট রাণীকেই সবাই ভালবাসতো বেশী।

রাজার সবই আছে, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা, হীরে-জহরৎ—কিছুরই অভাব নেই, তবু রাজার মনে সুখ নেই, রাজার ছেলেমেয়ে নেই, তাঁর পরে কে রাজা হবে, এত সুখ কে ভোগ করবে, কে বসবে সিংহাসনে?

যত দিন যায়, ততই রাজার ভাবনা বাড়ে, বসে বসে গালে হাত দিয়ে শুধু ভাবেন আর ভাবেন।

দিন যায়। কতদিন পরে ছোট রাণীর ছেলে হবে। রাজা ভারী খুসি। গরীব-দুঃখীকে মিঠাই খাওয়ালেন, যে যা চাইল তাকে তাই দিলেন। সবাইকার মুখেই হাসি ফুটলো। শুধু বড় রাণী হিংসেয় গুম্ হয়ে রইল, মুখে কথা নেই, সদাই থম্থমে ভাব।

ছোট রাণীর ঘর থেকে রাজা সোনার শিকল ঝুলিয়ে দিলেন রাজসভায়, ঘণ্টা বেঁধে দিলেন সোনার শিকলে, বললেন—যখন ছেলে হবে, এই শিকলে টান দিও, ঘণ্টা বাজবে, ঘণ্টা বাজলেই আমি এসে ছেলে দেখবো।

ছোট রাণীর ছেলে হবে, কাছে থাকবে কে? বড় রাণী বললো—বাইরের লোক কেন থাকে, ঘরের লোক আমি তো আছি আমিই থাকবো।

রাজা বললেন—সেই ভাল।

বড় রাণী ছোট রাণীর ঘরে গিয়েই শিকল ধরে নাড়া দিল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলো রাজসভায়। রাজা চম্কে উঠলেন, তখনই ছুটে এলেন বাড়ীর ভিতর। ছোট রাণীর মহলে এসে দেখেন—কিছুই না।

রাজা ফিরে গেলেন রাজসভায়।

খানিক বাদে আবার শিকলে টান পড়লো। রাজসভায় আবার ঘণ্টা বাজলো—ঢং ঢং ঢং! রাজা আবার ছুটে এলেন বাড়ীর ভিতর। ছোট রাণীর মহলে এসে দেখেন—কিছুই না। রাজার ভারী রাগ হোল, বললেন—ছেলে হবার আগে ফের যদি শিকল টানো, ফের যদি ঘণ্টা বাজাও তাহলে দুই রাণীকেই আমি কেটে ফেলবো।

শিকল আর নড়ে না, ঘণ্টা আর বাজে না। এদিকে ছোট রাণীর সাতটি ছেলে আর
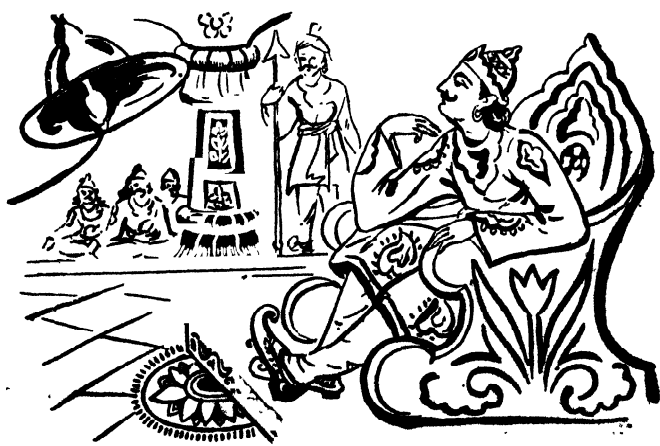
একটি মেয়ে হোল। ফুলের পাপড়ির মত ছেলেমেয়ে, আঁতুড় ঘর আলো হয়ে গেল।

বড় রাণী শিকল আর টানলো না, হিংসায় তখন তার বুক ফাটছে, মন চড় চড় করছে। তাড়াতাড়ি হাঁড়ি-সরা এনে, ছেলেমেয়েগুলিকে তার ভিতর পুরে পুকুরপাড়ে ছাইয়ের গাদায় পুঁতে দিয়ে এল। আসার সময় পুকুরপাড় থেকে ধরে আনলো কতকগুলি বেঙ আর বেঙাচি। তারপর নাড়া দিল শিকলে। ঢং ঢং

করে ঘণ্টা বজলো, রাজা আবার ছুটে এলেন রাণীর মহলে, বললেন—কই, কেমন ছেলে হোল দেখি।

বড় রাণী এক হাঁড়ি বেঙ আর বেঙাচি এনে দেখালো, বললো—এই দেখুন।

রাজা তো অবাক—এই ছেলে! যত সব বেঙ আর বেঙাচি! রাগে তিনি তখনই ছোট রাণীকে বের করে দিলেন রাজবাড়ী থেকে। বড় রাণী এবার খুসি হোল, মুখে হাসি ফুটলো।

সতীন-কাঁটা দূর হোল, তার মন জুড়ালো, তিনি একাই এবার রাজবাড়ীর মহারাণী হলেন।

এদিকে ছোট রাণীর আর দুঃখের শেষ নেই। রাজরাণী আজ পথের ভিখারিণী— ঘুঁটে কুড়ায়, পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আর গাছ তলায় পড়ে থাকে। রাজরাণীর সোনার বরণ কালি হয়ে যায়, মাথার চিকণ কালো চুলে তেল অভাবে জট পাকায়। কোন দিন দুটি ভাত জুটে, কোনদিন-বা তা'ও জুটে না। ছোট রাণীকে আর চেনা যায় না।

এই ভাবেই দিন যায়।

এদিকে রাজার মনে সুখ নেই, ছেলেনেই, কে রাজা হবে, কে সব ভোগ বরবে, কে বসবে সিংহাসনে? রাজপুরী যেন খা খা করে।

এদিকে রাজার বাগানেও আর ফুল ফোটে না। মালী এসে বলে—গাছে তো আর ফুল ফুটে না, ঠাকুর-দেবতার পূজা হবে কি করে?

দেবদেবীর পুজায় আর ফুল পড়ে না। রাজা বসে বসে ভাবেন, আর হা-হুতাশ করেন। দিন কাটে।

কতদিন পরে পুকুরপাড়ের এক গাছে ফুল ধরলো—সাতটি চাঁপা আর একটি পারুল ফুল—সোনার বরণ সাতটি চাঁপা আর দুধের বরণ একটি পারুল।

মালী দেখে ভারী খুসি হোল, অনেক দিন পরে আজ দেবতার পূজার ফুল পাওয়া গেল। সে গেল সেই পূজায় ফুল তুলতে।

মালীকে দেখেই পারুল ফুল বলে উঠলো—

সাত ভাই চম্পা জাগ রে—

অমনি সাতটি চাঁপা নড়ে উঠলো, সাড়া দিল—

কেন বোন্ পারুল ডাক রে—

পারুল বললো—

মালী এসেছে ফুল তুলিতে,
পূজার ফুল দেব কি নিতে ?

সাত চাঁপা বললো—

দেব না, দেব না ফুল, বল গো পারুল,
আগে আসুক রাজা, তবে দেব ফুল।

গাছের ডাল সোজা হয়ে গেল, তরতর

সরসর করে সব কটি ফুল উপরে উঠে গেল, মালী আর হাতের নাগাল পেলে না।

মালী তো অবাক, ফুলে যে কথা বলে সে কখনও শোনেনি। সাজি ফেলে সে দৌড়ে গেল রাজসভায় রাজার কাছে, বললো—মহারাজ, শুনেছেন কখনও ফুলে কথা কয়? ফুলেরা আপনাকে ডাকছে!

ফুলে কথা কয়! রাজা তো অবাক, রাজসভার সবাই অবাক। তখনই সবাই ছুটলো পুকুর-পাড়ে, গাছ-তলায়। চমৎকার ফুল—সোনার মত চাঁপা, দুধের মত পারুল। রাজা গেলেন ফুল তুলতে। অমনি পারুল ফুল গাছের ডালে দুলে উঠলো, ডাক দিল—

সাত ভাই চম্পা, জাগ রে—

চাঁপারা বললো—

কেন বোন্ পারুল ডাক রে—

পারুল বললো—

রাজা এসেছেন ফুল তুলিতে,
পূজার ফুল দেব কি নিতে?

চাঁপারা জবাব দিল—

দেব না, দেব না ফুল, বল গো পারুল,

আগে আসুক বড় রাণী, তবে দেব ফুল।

ডাল সোজা হয়ে গেল, সরসর তরতর করে ফুল উপরে উঠে গেল, রাজার হাতের নাগালের অনেক উপরে। রাজা তো অবাক।

ডাক বড় রাণীকে!

তখনই বড় রাণীর ডাক পড়লো। বড় রাণী এলেন। বড় রাণী ফুল তুলতে গেলেন, ফুলেরা বললো—

দেব না, দেব না ফুল বল গো পারুল,
আসুক আগে ঘুঁটে কুড়াণী,
মাথায় জট দুয়ো রাণী,
তখন হবে ঠাকুর পূজা, তখন দেব ফুল।

রাজা বললেন—খুঁজেআনোদুয়োরাণীকে। দিকে দিকে লোক ছুটলো, পাইক-পেয়াদা খুঁজতে বেরুলো, কত মাঠ-ঘাট ঘুরে তারা ঘুঁটে কুড়াণী দুয়ো রাণীকে খুঁজে আনলো। হাতে গোবর, মাথায় জট, ছেঁড়া কাপড় পরণে, ছোট রাণী এসে দাঁড়ালো গাছ তলায়। পারুল ফুল হাঁক দিল—

মা এসেছে, মা এসেছে, আয় রে নেমে ভাই,
ভাই বোন সবাই মোরা মায়ের কোলে যাই।

মা মা বলে সাড়া উঠলো। সাত চাঁপার ভিতর থেকে সাতটি ছেলে, আর পারুল ফুলের ভিতর থেকে একটি মেয়ে ছোট রাণীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ছেলেমেয়ে তো নয়, যেন এক এক টুকরো চাঁদের কণা, হীরের টুকরো।

সকলে তো অবাক। রাজা বললেন—কি কি, এমন কেন?

সবাই বললো—তাইত, এমন কেন?

পারুল গরগর করে বললো সব কথা—হাঁড়ির ভিতর ছেলেমেয়েকে পুঁতে রাখার কথা, বেঙ-বেঙাচির কথা।

বড় রাণী ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

সব শুনে রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—এমন রাণীর এখনই সাজা হওয়া দরকার ! হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে বড় রাণীকে এখনই পুঁতে ফেল।

তারপর সোনার বরণ সাত ছেলে, দুধের বরণ পারুল মেয়ে, আর ছোট রাণীকে নিয়ে রাজা রাজবাড়ীতে ফিরে এলেন। রাজপুরীতে সাড়া পড়ে গেল, নহবৎখানায় সানাই বাজলো, সবাই খুসি, সবাকার মুখেই হাসি।—

রাজা ছেলে ফিরে পেল,
দুয়োরাণী ঘরে এল,
আমার কথাও ফুরিয়ে গেল—

আমার কথাটি ফুরুলো
নটে গাছটি মুড়ুলো।
কেন রে নটে মুড়ুলি !
গরু কেন খায় !

কেন রে গরু খাস !
রাখাল কেন ভাত দেয় না !
কেন রে রাখাল ভাত দিস্ না !
বউ কেন রাঁধে না !
কেন রে বউ রাঁধিস্ না !
পিঁপড়ে কেন কামড়ায় !
কেন রে পিঁপড়ে কামড়াস্ ?
কুটুস্ কুটুস্ কামড়াবো
গর্তের মাঝে সেঁধোবো,
করবি কি তুই কর
করিনে কাউকে ডর।

সোনারকাঠি
রুপারকাঠি

সোনার কাঠি-রূপার কাঠি

এক ছিল রাজা। রাজার একটি ছেলে। ছেলের ভারী আদর, যখন যা আবদার করে তখন তাই। রাজকুমার একদিন আবদার ধরলো মৃগয়া করতে যাবে। রাজবাড়ীতে সাজসাজ রব পড়ে গেল। হাতীশালা থেকে হাতী এলো, ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া এলো, পাইক সাজলো, পেয়াদা সাজলো, বর্শা হাতে নিয়ে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে রাজার ছেলে শিকারে বেরুলো।

নগর ছাড়িয়ে রাজকুমার এলো বনে। বনের মাঝে চোখে পড়লো একটা হরিণ।

ছুটলো হরিণের পিছনে। হরিণ ছুটলো বনে বনে, রাজকুমারও ছুটলো হরিণের পিছু পিছু —শেষে হরিণটা বনের মাঝে কোথায় হারিয়ে গেল। রাজকুমার দেখলে সে-ও বনের মাঝে হারিয়ে গেছে,—লোকজন, পাইক-পেয়াদা কেউ কোথাও নেই। একা একা বনের মাঝে সে ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে বেলা পড়ে এলো। ফিরে আসার সে পথ পেলে না। রাজকুমারের ভাবনা হোল, ভয় হোল।

অনেক ঘোরাঘুরির পর বনের মাঝে রাজকুমারের চোখে পড়লো একটা ভাঙা দেবালয়। অনেক দিনের পুরানো ভাঙা বাড়ী। রাজকুমার

ঠিক করলো সেই খানেই রাতটা কাটিয়ে দেবে। সে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। ভিতরে জায়গা বড় কম, চূণের গামলা, দড়ি, বাঁশ, সব পড়ে আছে, কারা যেন দেবালয়ে চূণকাম করছে। এক পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে কোন রকমে সে শুয়ে পড়লো। সারা দিনের ঘোরাঘুরি, শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

সেখানে থাকতো এক রাক্কসী, দিনে সে বেরুতো, রাতে ফিরে এসে সেই ভাঙা দেবালয়ে শুয়ে থাকতো। সেই রাতে রাক্কসী ফিরে এসে দেখে দেবালয়ের দরজা ভিতর থেকে খিল আঁটা। ভিতরে তবে কেউ আছে।

দরজায় একটা ঠেলা দিয়ে রাক্কসী হাঁক দিলে—হাঁউ মাউ খাঁউ, কেরে আমার ঘরে ?

রাজকুমারের ঘুম ভেঙে গেল, সে বললো—

—রাক্কোসের দাদা খোক্কোস, তুই কেরে?

রাক্‌কসী বললো—তোকে তো আমি চিনি নারে,
বেরিয়ে আয় না, দেখি তোরে।
রাজকুমার বললো—কেন মিছে বকাস্ মোরে,
আমি এখন ঘুমুই পড়ে।
রাক্‌কসী বললো—তুই আমার দাদা যে রে,
তোকে একবার দেখবো না রে?
রাজকুমার বললো—উঠতে চাই নারে—
উঠি তো তোকে খাব ধরে।
রাক্‌কসী বললো—তুই আমার দাদা যে রে,
লেজটা একবার দেখা নারে।

রাজকুমার চট্ করে দড়িগাছি কুড়িয়ে নিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বের করে দিলে, বললে—রাত দুপুরে কেন বাজে বকাস্
এই লেজে জড়িয়ে গলায় দেব ফাঁস।

রাক্‌কসী দড়িটায় ভাল করে হাত বুলিয়ে দেখলে, তারপর আর কিছু না বলে চলে গেল।

রাজকুমার আর ঘুমুতে পারে না, কেবলই মনে হয় কখন রাক্‌কসী এসে দরজা ভেঙে

তাকে মেরে খেয়ে ফেলবে। সে জেগে বসে থাকে এক কোণে।

খানিক পরে আবার রাক্কসী এলো, হাঁকলো—হাঁউ মাউ খাঁউ ঘুমুতে না পাঁউ,
খোক্কোস্, তুই জেগে আছিস রে?

রাজার ছেলে বললো—আবার কেন এলি ফিরে ?

রাক্কুসী বললো—তুই আমার দাদা যে রে,
থুতু ফেলে দেখা না রে।

রাজার ছেলে চূণের গামলা থেকে এক

খাবলা চূণ জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে, বললে—দাদাকে চিনিস্ নে এমন মুখ্খু,

এই দেখ থুতু,—ওয়াক্—থুঃ—

রাক্কসী চূণ হাতে নিয়ে দেখলো, তারপর চলে গেল।

রাজার ছেলে জেগে বসে রইল। খানিক বাদে রাক্কসী আবার ফিরে এলো, দরজায় ঠেলা দিয়ে হাঁকলো—হাঁউ মাউ খাঁউ,

ঘুমুতে না পাঁউ।

খোক্কোস্, তুই ঘুমুলি নাকি?

রাজার ছেলে বললো—কেন, বল দিকি?

রাক্কসী বললো—তুই আমার দাদা যে রে

নখটা তোর দেখা না রে।

রাজার ছেলে তখনই বাঁশের একটি চাক্লা কেটে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে, বললে—বার বার ঘুম ভাঙাস্ কেন রে?

এই দেখ নখ, দেব কান ছিঁড়ে।

রাক্কসী নেড়েচেড়ে দেখলো, তারপর চলে গেল, সারা রাত আর এলো না।

সকাল হোল। আকাশ ফরসা হতেই রাজার ছেলে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো। বন-বাদাড় পার হয়ে চললো মাঠের পথ ধরে। মাঠ আর মাঠ, মাঠের বুঝি আর শেষ নেই। চলারও শেষ নেই। শেষে যখন আর চলতে

পারে না, এমন সময় চোখে পড়লো মাঠের মাঝে এক বিরাট বাড়ী, যেন রাজবাড়ী। বাড়ীর ভিতর ঢুকে দেখে, কেউ কোথাও নেই, খালি বাড়ী খা খা করছে।

এঘর ওঘর ঘুরতে ঘুরতে দেখে এক ঘরে এক রূপার খাটে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। মেয়েটিকে সে ডাকলো, কোন সাড়া নেই। তার চোখে পড়লো মেয়েটির মাথার কাছে রয়েছে একটি সোনার কাঠি আর একটি রূপার কাঠি। রাজকুমার মেয়ের মাথায় সোনার কাঠিটি ছোঁয়ালো, অমনি মেয়েটি চোখ মেলে

উঠে বসলো, অবাক হয়ে তাকালো তার মুখের পানে, বললো—তুমি কে ?

মেয়েটি বললো—এটা এক রাজবাড়ী। আমি রাজার মেয়ে। এক রাক্কসী আমাদের সাবাইকে খেয়ে ফেলেছে শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যদি বাঁচতে চাও তো এখান থেকে পালাও।

রাজার ছেলে বললো—রাক্কসীকে মেরে তোমাকে আমি এখান থেকে নিয়ে তবে যাব।

কি করে রাক্কসীকে মারবে সেই হলো তাদের কথা। তারপর রাজার মেয়েকে রূপার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাজার ছেলে পাশের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

রাত হতেই রাক্‌কসী ফিরলো, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙালো, বললো—হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের হাওয়া পাঁউ, কার হাওয়া রে ?

রাজার মেয়ে বললো—আর মানুষ কোথায় ? আমি আছি, আমাকেই খাও।

রাক্‌কসী বললো—বালাই ষাট্‌ তোকে খাব কি, তুই তো আমার মেয়ে।

রাজার মেয়ে এক বাটি তেল নিয়ে বসলো, বললো—মাসী, তুই অনেক ঘুরে এসেছিস, তোর পয়ে একটু তেল মালিস করে দি।

রাক্‌কসী হেসে বললো—বেশ বেশ, দে।
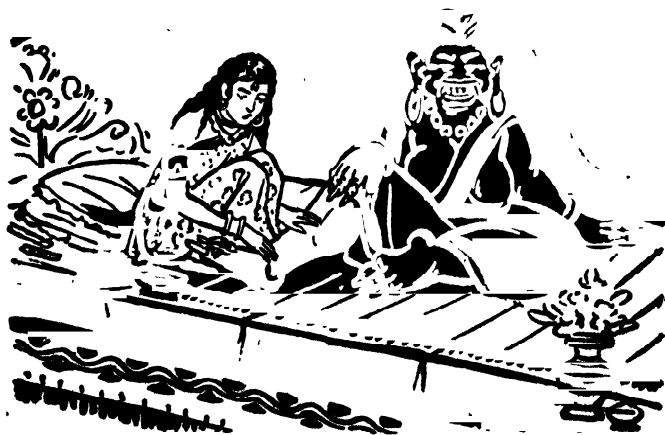
তেল মালিস করতে করতে মেয়েটি বললো—মাসী, আমার সদাই ভয় করে, তুই যদি আজ মরে যাস্, তাহলে এখানে আমি একা থাকবো কেমন করে?

রাক্কসী বললো—পাগলী মেয়ে, আমার কি আর মরণ আছে। আমাকে মারলেও মরবো না।

রাজকুমারী বললো—যদি কেউ তোর গলা কেটে ফেলে?

রাক্কসী বললো—তখনই আবার মাথা জোড়া লেগে যাবে। ওই দীঘির নীচে এক ফটিকের থাম আছে, থামের ভিতর এক কৌটায় একটি কালো ভোম্‌রা আছে, যদি কেউ সেই ভোম্‌রাকে মারতে পারে তবেই আমি মরবো।

মেয়েটি আর কোন কথা বললো না। তেল মালিস করতে করতে রাক্কসী কখন ঘুমিয়ে পড়লো, রাজকুমারীও ঘুমালো!

পরদিন সকালে আকাশ ফরসা হতেই

রাক্কসী উঠলো, রাজকুমারীকে রূপার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সে বেরিয়ে গেল।

হুস্ হুস্ করে রাক্কসী চলে গেল। রাজার ছেলেও পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে মেয়েটিকে জাগালো। রাজার মেয়ে বললো—কালো ভোম্‌রার কথা।

দু'জনে গেল দীঘির ধারে। নীল জল টলটল করছে। রাজার ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। এক ডুবে জলের নীচে গিয়ে লাথি মেরে ভাঙলো ফটিকের থাম। থামের ভিতর থেকে তুলে নিল কৌটা। তারপর পাড়ে এসে কৌটা খুলে বের করলো কালো ভোম্‌রাটিকে।

ওদিকে রাক্‌কসী তখন টের পেয়েছে। মাঠের উপর দিয়ে হুস্‌হুস্‌ করে দৌড়ে আসছে আর চীৎকার করছে—ওরে মারিস্‌ নেরে মারিস্‌নে, তোদের পায়ে পড়ি।

রাজার ছেলে আর দেরী করলো না। ভোম্‌রাটিকে তখনই পিষে মেরে ফেললো। রাক্‌কসীও মাঠের মাঝে ধপাস্‌ করে পড়লো আর মরলো।

এবার রাজার মেয়েকে নিয়ে রাজার ছেলে বাড়ী ফিরলো। অনেক ধূমধাম করে রাজার ছেলের সংগে রাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

আমার কথাটিও ফুরুলো—

এক যে ছিল রাজা

এক যে ছিল রাজা

এক ছিল রাজা। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক-জন পাইক-পিয়াদা, টাকা-পয়সা, কিছুরই অভাব নেই। সুখেই রাজার দিন কাটছিল। একদিন রাজার সখ হোল শিকার করতে যাবেন। লোক-জন পাইক-পিয়াদা নিয়ে রাজা তো বেরিয়ে পড়লেন। নগর ছাড়িয়ে মাঠ পার হয়ে এসে পড়লেন এক বনে।

গভীর বন। বনের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে রাজা একটি হরিণ দেখতে পেলেন। রাজা

তাড়া করলেন—হরিণ ছুটলো, রাজাও ছুটলেন। লোক-জন সব পিছনে পড়ে রইল, রাজা আরও গভীর বনে গিয়ে ঢুকলেন। তবু হরিণটাকে মারতে পারলেন না, জংগলের ভিতর হরিণটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। রাজাও পথ হারিয়ে ফেললেন।

বনের ভিতর পথ খুঁজে ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ রাজার চোখে পড়লো এক গাছতলায় একটি মেয়ে বসে বসে কাঁদছে। চাঁদের মত তার রূপ।

রাজা কাছে গিয়ে বললেন—কে তুমি? এখানে বসে কাঁদছ কেন?

মেয়েটি বললো—আমার বাপ-মা খুব গরীব, আমার বিয়ে দিতে পারেননি, তাই আমাকে এই বনে ফেলে দিয়ে গেছেন। আমার নাম রূপকুমারী।

রাজা বললেন—বেশ, আমি তোমাকে রাণী করবো, চল আমার সাথে—

রূপকুমারীকে সংগে নিয়ে রাজা ফিরলেন।

রূপকুমারী হোল ছোট রাণী। নূতনের আদর বেশী, ছোট রাণীর খুব খাতির। বড় রাণীকে আর কেউ খাতির করে না। বড় রাণী দেখেন, বুঝেন আর মনের দুঃখে জানালার ধারে বসে বসে ভাবেন। দিন যায়, রাত যায়, বড় রাণী শুধু ভাবেন আর ভাবেন।

ছোট রাণী সুয়োরাণী, রাণী-আদরে থাকে।
বড় রাণী মনের দুঃখে ভগবানকে ডাকে।

একদিন রাতে জানালার ধারে বসে আছেন, এমন সময় হঠাৎ কিসের যেন একটা আওয়াজ

কানে এল। দেখেন কি, ছোট রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে এক রাক্‌কসীর রূপ ধরলো, তারপর হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল রাজবাড়ীর বাইরে। বড় রাণী চুপ করে বসে রইল। অনেক খ'ন পরে ছোট রাণী হিস্‌ হিস্‌ আওয়াজ করতে করতে ফিরলো, মুখে হাতে রক্ত মাখা। হাত মুখ মুছে রাক্‌কসী আবার রাণী সেজে নিজের ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলো। দেখে বড় রাণীর বড় ভয় হোল, কাঁপতে কাঁপতে তিনি জানালার কাছ থেকে পালিয়ে এলেন। সারা রাত আর ঘুমুতে পারলেন না।

পরদিন সকালেই বড় রাণী রাজাকে বললেন—মহারাজ, আমি দিন কতক বাপের বাড়ী ঘুরে আসি। অনেক দিন বাপ-মাকে দেখিনি।

রাজা বললেন—বেশ, যাও।

বড় রাণী বাপের বাড়ী চলে গেলেন। বাপের বাড়ী থেকে তিনি আর ফিরলেন না।

বাপের বাড়ীতে বড় রাণীর এক ছেলে

হোল। ফুট্‌ফুটে চাঁদের মত ছেলে। ছোট রাণীর ভয়ে রাজার কাছে তিনি কোন খবরই পাঠালেন না, চুপি চুপি ছেলেটিকে মানুষ করে তুলতে লাগলেন। মামার বাড়ীতে ছেলে মানুষ হোল,—ছেলেও বাপকে চিনলো না, বাপও ছেলেকে জানলো না।

চাঁদের মত রাজার ছেলে
মামার বাড়ী হাসে খেলে,
রাজা কোন খবর নাহি পায়,
বয়স বাড়ে—দিন যে বহে যায়।

দিন যায়, ছেলে বড় হয়।

একদিন রাজকুমার বললো—মা, সবাইকার বাবা আছে, আমার বাবা নেই?

বড় রাণী বললেন—তুমি রাজার ছেলে, আমি রাজার বউ। তোমার সৎমা রাক্কসী, তারই ভয়ে আমি এখানে পালিয়ে এসেছি।

বড় রাণী ছেলেকে ছোট রাণীর সব কথা বললেন।

মায়ের মুখে সব শুনে রাজকুমার সেই দিনই বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে।—

মায়ের দুঃখ রাখবে না আর
রাক্কসীকে করবে সাবাড়!

বরাবর রাজসভায় এসে সে বললো—রাজা, আমি চাকরী চাই।

রাজা ছেলেকে কখনও দেখেন নি, চিনতেন না, বললেন—এতটুকু ছেলে, কি কাজ করবে?

রাজকুমার বললো—যে কাজ দেবেন।

রাজা রাজকুমারকে চাকরী দিলেন—রাজবাড়ী পাহারা দেবার কাজ।

রাজকুমার আসে যায়, কাজ করে। চমৎকার চাঁদের মত ছেলে, ছোট রাণী দেখে আর ভাবে—ওর মাংস কত মিঠে। জিভ দিয়ে জল পড়ে। তবে রাজকুমার রাতে বাড়ী চলে যায়, ছোট রাণী তাকে ধরতে পারে না। দিনের বেলা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর জিভে জল পড়ে।

শেষে ছোট রাণী ক'দিন আর বিছানা থেকে ওঠেন না। এ পাশ ফিরে বলেন—আঃ, ওপাশ ফিরে বলেন—উঃ!

রাজা বললেন—কি হোল কি?

ছোট রাণী বললেন—আমার বড় অসুখ, হাড় মুড়মুড়ি বেয়ারাম হয়েছে। মাসীর বাড়ী থেকে ওষুধ আনাতে হবে তবে এ রোগ সারবে।

কে যাবে ছোট রাণীর মাসীর বাড়ী, কে যাবে ওষুধ আনতে? রাজকুমার বললো —আমি যাব।

ছোট রাণী একখানি চিঠি লিখে দিলেন। চিঠি নিয়ে রাজকুমার বেড়িয়ে পড়লো।

পথে রাজকুমার চিঠিখানি খুলে পড়লো। ছোট রাণী লিখেছে—মাসী, তোমার কাছে একে পাঠালাম, মেরে খেও। খানিক মাংস আমার তরে রেখে দিও, আমি গিয়ে খেয়ে আসবো।

রাজার ছেলে চিঠিখানা তখনই ছিঁড়ে ফেলে দিল, তারপর মাসীর বাড়ীর মাঠে গিয়ে হাঁক দিল—ও দিদিমা, দিদিমা গো!

রাণীর মাসী ডাক শুনে ছুটে এলো, বললো—তুই কে ভাই?

রাজকুমার বললো—আমি তোমার নাতি এসেছি। আমি রূপকুমারীর ছেলে দুধকুমার,—তোমার নাতি।

—বেশ বেশ—বলে রাক্কসী বুড়ী নাতিকে ঘরে নিয়ে গেল, কত আদর করলো, কত দই-মিঠাই খাওয়ালো। তারপর বললো—কেন এসেছিস্ ভাই, কি দরকার?

দুধকুমার বললো—মা'র হাড় মুড়মুড়ি রোগ হয়েছে, ওষুধ দাও!

বুড়ি ওষুধ দিল।

দুধকুমার বললো—দিদিমা, আমায় কিছু দেবে না?

বুড়ী বললো—কি চাস্ বল্?

ঘরে খাঁচার ভিতর ছিল একটি টিয়া পাখী, রাজার ছেলে বললো—তোমার ওই টিয়া পাখীটি আমাকে দাও।

বুড়ী বললো—ওটা যে তোর মায়ের পরাণপাখী রে, ও কি দিতে পারি?

দুধকুমার বললো—ওই পাখীই মা'র পরাণপাখী, ওরই ভিতর মা'র জীবন আছে?

তাহলে ওটা আমাকেই দাও, আমার কাছে থাকবে,—ভাল করে রাখবো। দুধ-ঘি খাওয়াব।

মাসী আর কি করে, নাতিকে খুসি করার তরে পাখীর খাঁচা নাতির হাতেই তুলে দিল।

মাসীর কাছ থেকে পাখীটা নিয়ে দুধকুমার দেশে ফিরলো।

দুধকুমার রাজাকে ওষুধ দিল, বললো—রাক্কসের দেশ থেকে ওষুধ আনলাম, রাণী-মা রাক্কসী। ছোট রাণীর মাসী, সে এক রাক্কসী,—

মূলোর মত দাঁত, হাতীর মত কান,
বাঘের মত হাঁ, মানুষ গিলে খান।

রাজা বললেন—বল কি ?

দুধকুমার বললো—সভা করুন। সভার মাঝে রাণীকে ডাকুন। আমি সবাইকে দেখিয়ে দোব, বুঝিয়ে দেব—

জানবে সকল লোকে,
দেখবে নিজের চোখে।

রাজা তখনই সভা ডাকলেন।

রাণী এসে দাঁড়ালেন সভার মাঝে।

দুধকুমার বললো—ছোট রাণী রাক্‌কসী।

রাজা বললেন—দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও।

দুধকুমার বললো—মানুষের মত রাণীর জীবন তার দেহের ভিতর নেই, আছে এই পাখীর ভিতর। এই দেখুন—

রাণীর মাসীকে দিয়ে ফাঁকী,
এনেছি রাণীর পরাণ পাখী।

দুধকুমার খাঁচা থেকে টিয়া পাখীটি বের

করলো, ভেঙে দিল পাখীর একখানি ডানা, ওদিকে মট্ করে রাণীর একখানী হাত ভেঙে গেল। রাণী চীৎকার করে, রাক্কসীর রূপ ধরে দুধকুমারকে খেতে এল—হাঁউ মাঁউ খাঁউ !

দুধকুমার তখনই পাখীর দুটি পা ভেঙে দিল, রাক্কসী রাণী তখনই দু'পা ভেঙে মাটীতে পড়ে গেল। তবু সে দুধকুমারের দিকে গড়িয়ে আসে।

দুধকুমার এবার পাখীর ঘাড় ভেঙে দিল। রাক্কসীও তখনই 'আঁক' করে মরে গেল—

সভার লোক দেখলো শেষে
রাণী নয়, রাক্কসী সে।

দুধকুমার এবার পরিচয় দিল—

বড় রাণী মা আমার,
রাজার ছেলে দুধকুমার।

রাজা তো ভারী খুসি। তখনই বড় রাণীকে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন। বড় রাণীর আর

কোন দুঃখ রইল না। সুখে রাজার দিন কাটতে লাগলো।

আমার কথাটিও ফুরুলো—
নটে গাছটি মুড়ুলো—

শেষ